ইসলাম ও দর্শন

অধ্যাপক গোলাম আযম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সকালে লাল সূর্য ওঠে, সারাদিন আলো বিতরণ করে, সন্ধ্যায় আবার লাল হয়ে ডুবে যায়। রাতে আকাশে অগণিত তারকা মিটিমিটি জ্বলে। চাঁদের হাসি রাতের সৌন্দর্য বাড়ায়। আকাশে সাদা মেঘ ভাসে। এসব যেমন মানুষ দেখতে পায়, তেমন পশু-পাখিরাও দেখে; কিন্তু মানুষ পশু-পাখির মতো শুধু চোখেই দেখে না– মানুষের মন এক অদ্ভুত চেতনা। তাই মানবমনে প্রশ্ন জাগে– সূর্য কোথায় চলে যায়? আবার কোথা থেকে আসে? আকাশটা কতটুকু উঁচু? চাঁদ কেমন করে শূন্যে চলে? পশু-পাখির মন নেই বলে তারা চোখে যতটুকু দেখে এর বাইরে আর কিছু জানার জন্য প্রশ্ন উঁকি মারে না।

শিশুর মনেও প্রশ্ন জাগে। কবির ভাষায়– "খোকা মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আমি কোথা থেকে? সূর্য মামা কোথা থেকে পেল এত আলো?" মানুষ জানতে চায়– আমি কে? আমাকে কে সৃষ্টি করল? এ বিশাল পৃথিবী কি এমনিতেই তৈরি হয়ে গেছে? নাকি এর কোনো স্রষ্টা আছে? স্রষ্টা মানুষকে কেন বানাল? মানুষ মরে কেন? মরে কি শেষ হয়ে যায়? মরার পর কি আরও জীবন আছে, নাকি জীবন এখানেই শেষ? পরকাল কেমন? প্রশ্নের কোনো শেষ নেই।

প্রশ্ন মানেই জানার পিপাসা। এ পিপাসা এমন তীব্র যে, না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। অস্থির হয়ে জানার চেষ্টা করতে থাকে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সব মানুষের মনেই অগণিত প্রশ্ন জাগে। চিন্তাশক্তি সবার সমান নয়। যে যার সাধ্য অনুযায়ী প্রশ্নের কোনো না কোনো উত্তর যোগাড় করে নেয়। কোনো জবাব না পেলেও প্রশ্নের মুখ বন্ধ হয় না। সন্তোষজনক জবাব না পেলে মনের অস্থিরতা থেকেই যায়। তাই জবাব যোগাড় করতেই হয়।

দর্শনের সংজ্ঞা

মনোজগতের প্রশ্নমালাই দর্শনের ভিত্তি। মনের প্রশ্নের জবাব তালাশ করাই দর্শন। চর্মচোখে যা দেখা যায় সেটুকু দেখেই মনের পিপাসা মেটে না। মন আরও গভীরে দেখতে চায়। এ দেখার চেষ্টার ফসলই দর্শনবিদ্যা।

ইংরেজিতে এর নাম Philosophy. Phylo ও Sophia শব্দ দুটো মিলে philosophy শব্দটি গঠিত হয়েছে। Philo মানে অনুরাগ বা আসক্তি। Sophia মানে জ্ঞান। তাহলে philosophy অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আসক্তি। জীবন ও জগতের অগণিত রহস্য মানবমনে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে সে বিস্ময়াহত অবস্থা থেকে মুক্তির আকুতিই হলো জ্ঞানানুরাগ। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তির প্রয়াসই Philosophy. বাংলায় এর অনুবাদ 'দর্শন'। দর্শন শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ অনুবাদ সার্থক।

আমার আপন চাচাত ভাই ও চাচাত ভগ্নিপতি প্রফেসর মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা ফিলসফির অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম না। দার্শনিকরা এর সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন তা জানার প্রবল আগ্রহ জাগল। ঐ প্রফেসরকে ফরমাশ দিলাম। সে বয়সে আমার অনেক ছোট। সে আমাকে এক কুড়ি দার্শনিকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে পাঠাল। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজ পাঁচ জনের সংজ্ঞা এখানে পেশ করছি :

১. Philosphy aims at the Knowledge of the eternal, of the essential nature of things. —Plato
অর্থাৎ, দর্শনের উদ্দেশ্য শাশ্বত ও বস্তুর আসল প্রকৃতির জ্ঞান।

২. Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things. —Weber
অর্থাৎ, প্রকৃতির সামগ্রিক ধারণা অর্জনের সন্ধান করা ও সবকিছুর বিশ্বজনীন ব্যাখ্যার চেষ্টাই হলো দর্শন।

৩. Philosophy is the Knowledge of effects from the causes and causes from the effects. —Hobbes
অর্থাৎ, কার্যকারণের ফলাফল ও ফলাফলের কার্যকারণের জ্ঞানই দর্শন।

www.priyoboi.com

৪. The question is not one of philosophy or no philosophy, but one of good philosophy or bad— every rational being has a philosophy of some Kind. —Dr. H. Stephen.

অর্থাৎ, দর্শন থাকা বা না থাকার প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হলো কল্যাণকর দর্শন বা অকল্যাণকর– প্রত্যেক যুক্তিবাদী সত্তারই কোনো না কোনো রকমের দর্শন আছে।

৫. Philosophy grows directly out of life and its need. Every one who lives, if he lives at all reflectively, is in some degree a philosopher. — Cunningham

অর্থাৎ, জীবন ও এর প্রয়োজন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে দর্শনের জন্ম। প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি– যদি সে সামান্য চিন্তাশীলও হয়, তাহলে সে কোনো না কোনো মানে একজন দার্শনিক।

শেষের দু'জনের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, মানুষ দার্শনিক জীব। কারণ, সব মানুষেরই চিন্তাশক্তি আছে। যার চিন্তার মান যে রকম, সে পরিমাণেই সে দার্শনিক। যদি সে ভালো মানুষ হয় তাহলে তার দর্শন কল্যাণকরই হবে। মন্দ হলে অকল্যাণকর হবে। মন্দ চিন্তাও দর্শন ঠিকই, তবে তা মন্দ দর্শন। কোনো মানুষের মধ্যেই দর্শন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নেই। কারণ সবার মনেই প্রশ্ন জাগে, সকলেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে এবং সাধ্যমতো উত্তর যোগাড় করে নেয়, উত্তর সঠিক-বেঠিক যা-ই হোক।

জ্ঞানের উৎস

দর্শনের সংজ্ঞার সারকথা হলো, উচ্চতর জ্ঞানচর্চা। ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে যে জ্ঞান চর্চা করা হয় তা-ই দর্শন। মানুষের সাধ্যের মধ্যে তিন প্রকার জ্ঞানের উৎস রয়েছে।

১. পঞ্চেন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। শৈশবকাল থেকে মানুষ এ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে। এসব উৎস খুব সামান্য জ্ঞানই দান করতে পারে। এটুকু জ্ঞান মানুষের কোনো প্রয়োজনই পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারে না।

২. বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি (Intellect Power) বা চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবৃত্তি। মানুষ এ উৎসের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করে থাকে।

৩. ইলহাম (Intuition) বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। এটা সাধনার সরাসরি ফসল নয়। সাধক ও গবেষকের চিন্তা-গবেষণার কোনো পর্যায়ে হঠাৎ জ্ঞানের আলো ঝলসে ওঠে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও মুজতাহিদের জীবনে এমনটা ঘটে থাকে।

জ্ঞানসাধনাই সৃষ্টিলোকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। জ্ঞানই মানুষের চালিকাশক্তি। জ্ঞানই আসল শক্তি। সব জ্ঞান কল্যাণকর নয়। একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানই সত্যিকার কল্যাণ বয়ে আনে। উপরিউক্ত তিনটি উৎস নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চিত উৎস নয়। চিন্তা, গবেষণা, সাধনা সবসময় নির্ভুল জ্ঞানের সন্ধান দিতে সক্ষম নয়। দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ (Dialectism) এ কথারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

দার্শনিকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান নির্ভুল না-ও হতে পারে। জ্ঞানজগতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. জে. সি. দেব একসময় দিনাজপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। আমি তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক। ছাত্র ইউনিয়নের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে ড. দেবকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়েছিলাম। তিনি জনৈক দার্শনিকের একটি কৌতুকপূর্ণ সংজ্ঞা শুনিয়েছিলেন–

Philosophy is search for a black cat in a dark room where there is no cat.

অর্থাৎ "দর্শন হলো, যে অন্ধকার ঘরে কোনো বিড়াল নেই সেখানে কালো বিড়ালের সন্ধান করা।"

এর মর্মকথা হলো, দর্শন প্রমাণিত কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নয়। দার্শনিকের অনুমানভিত্তিক লব্ধ জ্ঞান মাত্র। অনুমান ভুল হতেই পারে। অন্ধকার ঘরে এমন কাল্পনিক বস্তুর সন্ধান করা যা হয়ত সেখানে নেই।

www.priyoboi.com

নির্ভুল জ্ঞান অত্যাবশ্যক

সূরা আল বাকারার ২১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "হয়ত তোমরা কোনো জিনিসকে মন্দ মনে করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হয়ত তোমরা কোনো জিনিসকে পছন্দ মনে করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। আসলে আল্লাহই সঠিক জানেন। তোমরা জান না।" মানবজাতির ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষী।

আমরা জানতে পেরেছি যে, মানবমনের প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। মানবজীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

১. মানুষের আসল পরিচয় কী? মানুষ কি অন্যান্য পশুর মতোই পশু মাত্র?
২. কে তাকে সৃষ্টি করল? তার স্রষ্টার সঠিক পরিচয় কী?
৩. স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক আছে কি? থাকলে তা কেমন?
৪. মানুষকে পৃথিবীতে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে?
৫. বিশ্বজগৎ কে সৃষ্টি করল?
৬. বিশ্বজগতের সাথে মানুষের কেমন সম্পর্ক? কোনো সম্পর্ক আছে কি?
৭. মৃত্যুর পর কি আর কোনো জীবন আছে? থাকলে তা কেমন?
৮. মানুষকে ভালো ও মন্দের ধারণা কেন দেওয়া হয়েছে?
৯. এ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে কি স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে?
১০. স্রষ্টা কি মানুষকে এসব প্রশ্নের জবাবের জন্য হাতড়িয়ে বেড়াতে বাধ্য করেছেন? তিনি কি এসব বিষয়ে জ্ঞানদানের কোনো ব্যবস্থা করেন নি?

এসব মৌলিক প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

মানবজাতির জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, প্রগতি ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণ করতে হলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান অবশ্যই জরুরি। এ জরুরি বিধান কি মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব? কোন্ যুগের মানুষ, কোন্ দেশের মানুষ তা করতে পারবে? কেউ যদি এমন কোনো বিধান প্রণয়ন করে, অন্য সব মানুষ তা কেন গ্রহণ করবে? সর্বযুগে ও সকল দেশের মানুষের উপযোগী নির্ভুল বিধান রচনা করার দাবি কে করতে পারে?

এসব বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান থাকা সকল মানুষের জন্যই অত্যাবশ্যক। যিনি সকল মানুষের স্রষ্টা, তিনি ছাড়া এ জ্ঞান দান করার সাধ্য কি কারো থাকতে পারে?

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বিতরণ করে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া এ জ্ঞান দান করার সাধ্য কারো নেই।

ইসলামী দর্শন

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে উপরিউক্ত বিরাট বিরাট প্রশ্ন এবং এ জাতীয় অগণিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরই ওহীযোগে দিয়েছেন। বিশাল কুরআন ও লাখ লাখ হাদীসে এসবের যে নির্ভুল উত্তর রয়েছে তা-ই ইসলামী দর্শন। ঐসব উত্তরের পক্ষে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

যেহেতু ঐসব বিষয়ে মানুষের সরাসরি কোনো জ্ঞান নেই, সেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রশ্নের উত্তর যোগাড় করা ছাড়া উপায় নেই। এসব পরোক্ষ জ্ঞান অযৌক্তিক নয়। এসব যুক্তি যাদের মনকে তৃপ্ত করে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, সেসব সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো উপায় নেই। পরোক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এরই নাম 'বিশ্বাস'। তাই বিশ্বাস মানে যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত নয় বা বিশ্বাস মানে অন্ধ স্বীকৃতি নয়।

www.priyoboi.com

মানবজীবন ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে উপরিউক্ত প্রশ্নমালার উত্তর যুগে যুগে দার্শনিকগণ সন্ধান করেছেন। এসব প্রশ্নকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনো না কোনো উত্তর সংগ্রহ না করে কেউ ক্ষান্ত হতে পারেন নি। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে যারা গ্রহণ করেন নি তারা কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন নি। তাঁরা ধারণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা জ্ঞান নয়, আন্দাজ মাত্র।

তাই নবীকে দার্শনিক মনে করা চলে না। নবী অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেন না। আল্লাহর কাছ থেকে নবী সরাসরি জ্ঞান লাভ করেন। তাই আল্লাহ যেমন নির্ভুল, নবীও নির্ভুল। দার্শনিক নির্ভুল বলে দাবি করেন না, তাঁরা চিন্তা পরিবেশন করেন মাত্র। এ চিন্তা সঠিক হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তাই ওহীর জ্ঞানে যাচাই করা ছাড়া দার্শনিকের মতামত গ্রহণ বা বর্জন করা সঠিক নয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষের মনকে প্রশ্নের কারখানা বানিয়ে দিয়ে এসবের উত্তর তালাশে অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে বাধ্য করেন নি। তাই প্রথম মানুষটিকেই নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। নবীর নিকট প্রেরিত জ্ঞানের আলো সকল অন্ধকার দূর করতে সক্ষম।

আধুনিক ভ্রান্ত দর্শন

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে মুসলিম জাতি বিশ্বে প্রায় হাজার বছর মানবজাতির নেতৃত্ব দিয়েছে। দীনের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালন না করে শুধু নেতৃত্বের আসন দখল করে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করেন। ফলে মানবজাতি ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এ শূন্যতা পূরণের জন্য কত দার্শনিক এমন কতক মতবাদ পেশ করেন, যা আধুনিক বিশ্বকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। এসব মতবাদ দ্বারা আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবিত হয়েছিলাম। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ঐসব মতবাদের ভ্রান্তিগুলোকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে নাকচ করেছে। এ সাহিত্যই আমাকে ঐসবের বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করেছে। প্রধান কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছি :

১. Secularism (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ)

হোলি রোমান এমপায়ার গোটা ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। খ্রিস্টান পাদ্রিরাই প্রধান শাসক ছিল। তখন ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির ফলে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ পেল, যা পাদ্রিদের প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী। শাসক পাদ্রিরা ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে বৈজ্ঞানিকদেরকে কঠোর নির্যাতন ও শাস্তি দিতে লাগল। পাদ্রিদের অন্ধ বিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক সত্যের এ দ্বন্দ্ব ২০০ বছর ধরে চলেছিল। এতে জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

অবশেষে মার্টিন লুথার নামক এক ধর্মীয় নেতা তাদের ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে Concillior Movement নামে একটা আপস প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রস্তাবের সারমর্ম হলো– "জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। পাদ্রিগণ গির্জায় নেতৃত্ব দেবেন। গির্জাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হবে। রাষ্ট্র ও গির্জা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবে। কেউ কারো উপর আধিপত্য করবে না। তবে যেহেতু জনগণ ধর্মে বিশ্বাসী, সেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান গির্জায় গিয়ে রাজ্য শাসনের শপথ নেবেন।"

রণক্লান্ত ও গণবিদ্রোহে শঙ্কিত পাদ্রিগণ এ আপস প্রস্তাব মেনে নেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পাদ্রির নিকট শপথ নেওয়ার সম্মানটুকু পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন।

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ জন্মবৃত্তান্ত জানা যায়। খ্রিস্টধর্মের নেতাদের বিজ্ঞানবিরোধী হিংস্র আচরণের প্রতিক্রিয়ায়ই খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা হয়। ধর্মীয় নেতারা ধর্মের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। তাদের নিকট বাইবেলের নামে যে ধর্মগ্রন্থ ছিল তা আল্লাহর বাণী নয়, মানবরচিত। তাই তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্যের সংঘর্ষ বাঁধে। এ বিরোধ খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধেই ছিল।

www.priyoboi.com

ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনো প্রমাণিত সত্যের বিরোধ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। ডারউইনের থিওরি অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে; কিন্তু এটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক থিওরি বাস্তব গবেষণায় সত্য হিসেবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। পরবর্তীতে ডারউইনের থিওরি পরিত্যক্ত হয়।

বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের বস্তু নিয়ে গবেষণা করে এবং প্রকৃতির জগতে আল্লাহর প্রণীত বিধি ও তথ্য জানার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান কোনো বিধি ও তথ্য তৈরি করে না। ইসলাম আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান। তাই ইসলাম ও বিজ্ঞানের উৎস আল্লাহ। একই উৎস থেকে আগত দুটো জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে না। তাই ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই; বরং ইসলামই বিজ্ঞান চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই মুসলিম শাসনামলেই আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষিতমহল ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী। দুশ' বছর ইংরেজদের গোলাম থাকাকালে তারা আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা রেখে গেছে, এখনও তা-ই চালু রয়েছে। তাই খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জন্ম নিয়েছে তা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছেন। তাদের মধ্যে যারা নামায-রোযা-হজ্জ করেন তারা এ কথাটি কি বিবেচনা করেন না যে, তারা কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে বাদ দিয়ে শুধু নামায-রোযাটুকু মেনে নিচ্ছেন কোন্ যুক্তিতে? আল্লাহর বিধানকে আংশিকভাবে গ্রহণ করার কি অনুমতি আছে?

২. Dialectism (দ্বন্দ্ববাদ)

জার্মান দার্শনিক Hegel-এর মতবাদের সারকথা হলো– "মানুষের জন্য স্থায়ী কোনো জীবনবিধান নেই। যুগে যুগে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইতিহাসের শিক্ষার ভিত্তিতে কোনো বিধান রচনা করে এবং সে বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসব ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে, এর ভিত্তিতে ঐ বিধানকে সংশোধন করে নেয়। এভাবেই মানবসভ্যতা এগিয়ে চলছে। এরই নাম প্রগতি। এভাবেই ভুল সংশোধন করতে করতে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

এ মতবাদ মানুষের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, কোনো পুরনো বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। অতীতের দিকে তাকানো প্রগতিবিরোধী। এ মতবাদে দীক্ষিতরাই বলে থাকে, দেড় হাজার বছরের পুরনো ইসলাম আধুনিক যুগে অচল।

হেগেলের মতবাদকে দ্বন্দ্ববাদ বলা হয়। তাঁর মতে, যে বিধান রচনা করা হয় এর নাম থিসিস। বিধান প্রয়োগ করার পর যেসব ভুল ধরা পড়ে তা হলো এন্টি-থিসিস। সংশোধনের পর বিধানটি সিনথিসিস হিসেবে গণ্য হয়। আবার এতে ভুল-ত্রুটি দেখা গেলে সিনথিসিসটাই আবার থিসিসে পরিণত হয়। এভাবে হোঁচট খেতে খেতে মানবসভ্যতা এগুতে থাকবে। এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা স্বাভাবিক কারণেই আল্লাহর বিধান জানে না। স্থায়ী নির্ভুল বিধান তাদের কাছে নেই বলে চিরকাল হোঁচট খাওয়ার মতবাদকেই তারা মানতে বাধ্য।

ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে অতীতের শিক্ষাকে পরিত্যাজ্য মনে করার এ মতবাদ। যা কিছু নতুন তা-ই গ্রহণযোগ্য মনে করার এ রোগের ফলে একশ্রেণীর মানুষ আধুনিকতার মোহে বহু অর্থহীন, হাস্যকর, নৈতিকতাবিরোধী, এমনকি মানবতাবিরোধী প্রথাকেও গ্রহণ করে থাকে।

অথচ যা চিরসত্য তা সবই পুরনো। সত্য বলা, মিথ্যা পরিহার করা, সদ্ব্যবহার করা, কারো উপর যুলুম না করা, মানুষের উপকার করা, বিপদে সাহায্য করা ইত্যাদি সবই তো পুরনো শিক্ষা। নতুন বলেই কি সন্ত্রাস, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে?

৩. Materialism (বস্তুবাদ)

খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে পাদ্রিদের নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় এ মতবাদটির জন্ম। এ মতবাদের মর্মকথা হলো– "বিজ্ঞানচর্চাই সত্যের উৎস। বিজ্ঞান বস্তু ও বস্তুগত শক্তি (Matter and Material energy) নিয়ে চর্চা করে। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যা জানা যায় তা-ই সত্য। বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ, রাসূল, ওহী, পরকাল ইত্যাদি কতক অন্ধ বিশ্বাস। মানবজীবনের জন্য বস্তুই যথেষ্ট। বস্তুর ঊর্ধ্বে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।"

www.priyoboi.com

কিন্তু বাস্তবজীবনে সবাই স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, দেশপ্রেম, সহানুভূতি, দয়া-মায়া ইত্যাদি স্বীকার করে। অথচ এসবের কোনোটাই বস্তু নয়। মানুষ নিজেও পশুর মতো বস্তুসর্বস্ব নয়। রূহ-ই তো আসল মানুষ। রূহ তো বস্তু নয়– তাই এ মতবাদে রূহকেও স্বীকার করা হয় না।

খ্রিস্টান পাদ্রিদের অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ও বিজ্ঞানবিরোধী চরম অমানবিক আচরণ যে ধর্মদ্রোহিতার জন্ম দিয়েছে, এরই প্রতিক্রিয়ায় এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

ভ্রান্ত মতবাদের কুসন্তান

উপরিউক্ত তিনটি ভ্রান্ত মতবাদ থেকে এমন কতক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ জন্মলাভ করেছে, যা গোটা মানবজাতির মধ্যে বিভেদ, শোষণ ও বিভিন্ন ধরনের স্বৈরশাসন চালু করে ছেড়েছে। এসব মতবাদকে ঐ তিনটি ভ্রান্ত মতবাদের কুসন্তান বলে মাওলানা মওদূদী (র) আখ্যায়িত করেছেন।

১. ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

মুসলিম শাসনামলে আরবে রাজধানী থাকলেও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতি ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশজুড়ে ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ এক জাতি হিসেবেই পূর্ণ ঐক্যবোধ করত। হলি রোমান এম্পায়ার গোটা ইউরোপে বিস্তৃত ছিল। তখন খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে ঐক্যচেতনা বজায় ছিল। ধর্মের বন্ধন কেটে যাওয়ার পর যখন মহাশূন্যতা সৃষ্টি হলো তখনই দেশ ও এলাকাভিত্তিক জাতীয়তা সে শূন্যস্থান পূরণ করল। এর পর থেকেই মানবজাতির বিভেদ চরমে পৌঁছল। ইতিহাসে এর পূর্বে জাতিগত বিরোধ নিয়ে এত যুদ্ধ হয় নি।

মানুষের মধ্যে বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা এত শত্রুতার জন্ম দেয় নি– যতটা জাতীয়তাবাদ দিয়েছে। এ মতবাদ মানুষের অন্য সব পরিচয় মুছে ফেলে একমাত্র দেশভিত্তিক পরিচয়কেই তুলে ধরে। দেশভিত্তিক জাতীয়তা শুধু পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করা ইসলাম অনুযায়ী দূষণীয় নয়; কিন্তু জাতীয়তাবাদ এতে সন্তুষ্ট নয়। জাতীয়তাবাদের দাবি হলো, এক জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও মর্যাদার স্বার্থে অন্য জাতির উপর যুলুম করা যেতে পারে। ফলে এ মতবাদ পরস্পর বিদ্বেষ, হিংসা ও হিংস্রতা সৃষ্টি করে। এ মতবাদে উন্নতি ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সহযোগিতার মনোভাবের বদলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রধান হয়ে ওঠে। "My country, right or wrong" স্লোগানটি জাতীয়তাবাদেরই সৃষ্ট। এর মানে– আমার দেশ নিজের স্বার্থে যে সিদ্ধান্তই নেয় তা মন্দ এবং অন্যের প্রতি অন্যায় হলেও সমর্থনযোগ্য।

২. পুঁজিবাদ (Capitalism)

হোলি রোমান এম্পায়ার ধর্মের নামে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করে; কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে যা করা হচ্ছিল তা আল্লাহর দেওয়া বিধান নয়, ধর্মীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত। আল্লাহর বিধানে কোনো যুলুম থাকতে পারে না।

দুশ' বছরের দ্বন্দ্বের পর যখন খ্রিস্টধর্ম গির্জার মধ্যে বন্দি হয়ে গেল এবং জনগণ ধর্মের শিকল থেকে মুক্তি পেল তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার স্লোগান এত প্রবল হয়ে উঠল যে, রাষ্ট্রক্ষমতাকে শুধু আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার মতবাদ চালু হয়ে গেল। এ মতবাদের নাম Leisez-Fair-Theory. রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাফিক পুলিশ যেমন যানবাহন চলাচলের ব্যাপারে শুধু নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে, রাষ্ট্রের কর্মসীমাও তেমনি হয়ে গেল। ট্রাফিক পুলিশ শুধু সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার জন্য একদিকের যানবাহন থামিয়ে আরেকদিকের যানবাহনকে যেতে দেয়। এর বেশি কোনো দায়িত্ব তাদের নেই। তেমনিভাবে রাষ্ট্রকে শুধু জনগণের মধ্যে লড়াই-সংঘর্ষ বন্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্র শুধু পুলিশের মতো শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

এ মতবাদের ফলেই পুঁজিবাদের জন্ম হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ময়দানে সব মানুষ স্বাধীন। উৎপাদন, বণ্টন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। যারা সুসংগঠিতভাবে পুঁজি সংগ্রহ করে উৎপাদনে খাটায়, তারা

www.priyoboi.com

শ্রমিকদের প্রতি যুলুম করে কি-না, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি রেখে জনগণকে শোষণ করে কি-না ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব নেই।

৩. সমাজতন্ত্র (Socialism)

শিল্প-বিপ্লবের পর যখন বড় বড় কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কর্মরত হলো তখন শ্রমিকদের বেতন, কর্মসময়, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদিতে শিল্পপতিদের স্বেচ্ছাচার চলতে লাগল। এ যুলুম-নির্যাতন থেকে শ্রমিকদেরকে উদ্ধার করার স্লোগান নিয়ে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের মতবাদ শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম দিল। রাষ্ট্র যেহেতু পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না সেহেতু পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রকে উৎখাত করে শ্রমিকদের রাজত্ব কায়েমের দোহাই দিয়ে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র চালু করা হলো। দাবি করা হলো যে, শ্রমিকরাজ কায়েম হয়েছে, সকল প্রকার শোষণ খতম হয়েছে। তাদের দাবি হলো, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানাই শোষণের মূল। তাই উৎপাদন, বণ্টন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সবই সরকারি মালিকানাধীন থাকবে।

সমাজতন্ত্র দাবি করেছিল, শ্রমিকরাজ কায়েম হলে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে সাম্য কায়েম হবে এবং শোষণ ও যুলুম খতম হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, রাশিয়ায় এমন কঠোর রাষ্ট্র ও সরকার চালু হলো, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল এবং জনগণ সর্বদিক দিয়ে সরকারের গোলামে পরিণত হলো। পুঁজিবাদ খতম না হয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ চালু হলো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকরা আন্দোলন করে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারত, এমনকি ধর্মঘটের সুযোগও নিতে পারত; কিন্তু সমাজতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনের সুযোগই রইল না। সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক ময়দানে দুর্বল হতে লাগল। সরকারি গোলাম হিসেবে জনগণ কর্মপ্রেরণা হারিয়ে ফেলল। উৎপাদন লাভজনক রইল না। কায়েমের ৭০ বছর পর বিংশ শতকের আশির দশকের শেষদিকে সোভিয়েত রাশিয়াতেই সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৬টি রিপাবলিক এক বিরাট পরাশক্তি ছিল। তাদের ঐক্যের ভিত্তিই ছিল সমাজতন্ত্র। প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের আমলে যখন সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে পরিত্যাগ করা হলো তখন বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রিপাবলিক পৃথক হয়ে যেতে লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল। শুধু রাশিয়াই একা রয়ে গেল।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কোনো বহিরাগত শক্তি হামলা করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দেয় নি, কোনো পুঁজিবাদী শক্তি আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করে নি; সমাজতন্ত্র নিজ পিতৃভূমিতেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

৪. জাতীয়তাবাদী স্বৈরতন্ত্র

জাতীয়তাবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেই জার্মানিতে হিটলার নাজিবাদ (Nazism) এবং ইটালিতে মুসোলিনি ফ্যাসিবাদ (Fascism) নামে দুটো মতবাদের দোহাই দিয়ে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে। হিটলারের দাবি ছিল, জার্মান জাতিই বিশ্বে একমাত্র বিশুদ্ধ আর্যজাতি। তাই গোটা বিশ্ব শাসন করার অধিকার একমাত্র তাদেরই। গোটা ইউরোপে জার্মানদের কর্তৃত্ব কায়েমের স্লোগান তুলে হিটলার দেশবাসীকে বিজয়ের নেশায় পাগল করে তুলল। হিটলার ও মুসোলিনির বিশ্বজয়ের নেশা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে মানবজাতির বিপর্যয় সৃষ্টি করল।

ভ্রান্ত দর্শনের পরিণতি

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ মহাসত্য আবিষ্কৃত হলো যে, স্রষ্টার সাথে সম্পর্কহীন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যেসব দর্শন ও মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে, এর পরিণতি কতই না করুণ! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, দ্বন্দ্ববাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র মানবজাতিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে– যা থেকে মুক্তির কোনো পথই দেখা যাচ্ছে না।

ভ্রান্ত দর্শনে বিশ্বাসী বিশ্বনেতৃত্ব ক্রমেই অশান্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি এ অশান্তি বৃদ্ধিতে আরও সহায়ক হয়েছে। বিজ্ঞান বিশ্বজগতের যত শক্তি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে তা ভ্রান্ত নেতৃত্বের হাতেই ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.priyoboi.com

ইসলামী দর্শনের নেতৃত্ব না থাকায় মানবজাতি আজ মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তাআলা মানব-জাতির মধ্যে ভারসাম্য কায়েম রাখার দায়িত্ব দিয়ে 'মধ্যপন্থী জাতি'র মর্যাদা এবং তাদেরকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে মানবজাতির কল্যাণে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যতদিন মুসলিম উম্মাহ এ দায়িত্ব পালন করেছে ততদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি মানবজাতির কল্যাণের কাজে লেগেছে। মুসলিম উম্মাহ এ দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হওয়ার পরিণতিতেই মানবজাতির বর্তমান বিপর্যয়। তাই এ বিপর্যয়ের জন্য মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দকে আল্লাহর দরবারে নিশ্চয়ই জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। যে উম্মাহকে মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সে উম্মাহর নেতৃবৃন্দ বর্তমানে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত নেতাদের আনুগত্য করছে। আরও বেদনার বিষয় হলো, আলেমসমাজের অধিকাংশই আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ববোধ করেন না। অথচ উম্মাহকে এ বিষয়ে সজাগ করার দায়িত্ব তাঁদেরই। মুসলিম জনগণ দীনের যেটুকু আলো পায় তার সবটুকু আলেমসমাজেরই অবদান। তাঁরাই যদি ইকামাতে দীনের দায়িত্ববোধ না করেন এবং শুধু খিদমতে দীনকেই যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে উম্মাহকে আর কারা জাগ্রত করবে?

ইসলামী দর্শনই শান্তির একমাত্র পথ

এ জগৎ ও জীবন এবং পরকাল সম্পর্কে ইসলাম যে দর্শন পেশ করেছে, একমাত্র তা-ই দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ। সব মানুষই শান্তি চায়। অথচ সবাই যা চায় তা-ই কেউ ঠিকমতো পাচ্ছে না। কেমন করে পাবে? শান্তি দেওয়ার আসল মালিক যিনি, তিনি শান্তি পাওয়ার যে বিধি দিয়েছেন তা মেনে না চললে শান্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

প্রকৃতির জগতে যে শান্তি বিরাজ করছে তা এ কারণেই যে– সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ তাআলা যে বিধান তৈরি করেছেন তা তিনি নিজেই চালু রেখেছেন বলে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। মানুষ যদি তাদের জন্য রচিত বিধান মেনে চলে তাহলে তারাও শান্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা যেভাবে গোটা সৃষ্টিজগৎকে তাঁর দেওয়া বিধান মেনে চলতে বাধ্য করেছেন, মানুষকে সেভাবে বাধ্য করেন নি। তাই সে বিধান মানা ও না মানার স্বাধীনতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে। মানুষ ঐ বিধান না মানার কারণেই অশান্তি ভোগ করছে।

দুনিয়ায় আযাবের বিধান

আল্লাহ দুনিয়াতেও শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহর নির্ভুল বিধান অমান্য করে নিজেদের তৈরি বিধান মানার কারণেই তো স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অশান্তি ভোগ করে। অবাধ্যতার বিশেষ সীমা লঙ্ঘন করলে আল্লাহ দুনিয়ায়ও কিছু শাস্তি দেন; পরকালে তো কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি চিরকালই ভোগ করতে হবে।

দুনিয়ায় শাস্তি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে সূরা আনআমের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাঁর (আল্লাহর) এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি তোমাদের উপর আযাব নাযিল করে দিতে পারেন। তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে এক দলকে অপর দলের ক্ষমতার মজা ভোগ করাতে পারেন।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ৩ রকমের আযাব দিতে পারেন :

১. উপর থেকে। অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-তুফান, বজ্রপাত, তুষারপাত, হারিকেন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি।
২. নিচ থেকে। অর্থাৎ ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড, পঙ্গপাল, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, ভূমিধস ইত্যাদি।
৩. গৃহযুদ্ধ। বিভিন্ন কারণে জনগণের মধ্যে এমন বিরোধ সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে মারামারি, কাটাকাটি, বোমাবাজি ইত্যাদি চলতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের খিদমত করার জন্য ভূমি, পানি, বাতাস ও আগুন দান করেছেন। পৃথিবীতে এসব জিনিসকে ব্যবহার করেই মানুষ সুখ-শান্তি উপভোগ করে। এসব বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যতক্ষণ এসবকে মানুষের খিদমত করতে অনুমতি দেন ততক্ষণ এরা খিদমত করতে থাকে। যখনই তিনি কোনো জনগোষ্ঠীর উপর অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন তখন খিদমতে নিযুক্ত এ বস্তুগুলোকেই আযাবে পরিণত করেন। ভূমি, পানি, বাতাস, আগুন মানুষের খিদমত করার বদলে শাস্তির উপকরণে পরিণত হয়। আর শাস্তির অপর মাধ্যম হলো গৃহযুদ্ধ।

www.priyoboi.com

সুখ-দুঃখের দার্শনিক সংজ্ঞা

অভাবই দুঃখের মূল কারণ। মানুষ যা চায় তা না পেলেই দুঃখবোধ করে। এ না পাওয়াটাকেই অভাব বলতে হয়। সুখ মানে অভাবশূন্যতা। যা চায় তা-ই যদি পায় তাহলেই সুখবোধ হয়। কুরআনে বেহেশতের সুখের বস্তুগত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর সাথে দোযখের দুঃখ-কষ্টের বিশদ বিবরণও আছে। সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ-এর ৩১ নং আয়াতে বেহেশ্তের দার্শনিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়– "দুনিয়ার জীবনেও আমি তোমাদের অভিভাবক এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই পাবে। আর তোমরা যা দাবি করবে তা তো পাবেই।"

অর্থাৎ বেহেশত এমন চিরস্থায়ী আবাস, যেখানে কোনো কিছুরই অভাব থাকবে না। কারণ, মন যা চাইবে তা-ই পাওয়া যাবে। দাবি করার কোনো দরকারই হবে না। দাবি করলে তো পাবেই। না চাইলেও শুধু কামনা করলেই পাওয়া যাবে। তাই দুঃখের কোনো কারণই থাকবে না। বেহেশতে শুধুই সুখ, দুঃখের কোনো কারণ ঘটবে না। বেহেশতে শুধু অভাবেরই অভাব; আর কিছুরই অভাব নেই।

দোযখের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে শুধুই দুঃখ। দুঃখ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। কারণ, সেখানে অভাব আর অভাব। সূরা নাবা'র ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "সেখানে তারা গরম পানি ও পুঁজ ছাড়া কোনো রকম ঠাণ্ডা ও পান করার মতো কোনো কিছুরই স্বাদ পাবে না।"

অর্থাৎ দোযখীদের পিপাসা লাগলে এ অভাব দূর করার জন্য কিছুই দেওয়া হবে না; বরং এমন কিছু দেওয়া হবে, যা তাদের অভাব আরও বাড়িয়ে দেবে। ঠাণ্ডা পানির অভাব দূর করার বদলে গরম পানি দিয়ে অভাবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে। তাই দোযখ ঐ চিরস্থায়ী আবাস, যেখানে শুধুই অভাব রয়েছে; অভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। অভাবকে কমানোর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না; বরং অভাব বাড়তেই থাকবে। তাই সেখানে দুঃখের শেষ নেই, শুধু দুঃখ আর দুঃখ।

সুখ ও দুঃখের ব্যাপারে দুনিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সুখ ও দুঃখ একসাথেই আছে। এখানে শুধু সুখ ও শুধু দুঃখ নেই। সুখের সাথে দুঃখ এবং দুঃখের সাথে সুখও রয়েছে। সূরা আলাম নাশরাহ-এর ৫ ও ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে। নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।"

কবির ভাষায়–

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?

গোলাপ ফুলের সুগন্ধের স্বাদ উপভোগ করতে হলে ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ভয়ে ফুল না তুললে সুগন্ধ কেমন করে পাবে? দুনিয়ায় দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ করা যায় না। জমির ফসল পেতে হলে সেখানে অনেক কষ্ট করে চাষাবাদ করতে হবে। দাম্পত্য জীবনের সুখ উপভোগ করতে চাইলে বিবাহিত জীবনের বহু ঝামেলা পোহাতেই হবে। মা হওয়ার কামনা পূরণ করতে হলে গর্ভধারণ থেকে প্রসবযন্ত্রণা ও সন্তান লালন-পালনের যাবতীয় মুশকিল সহ্য করতেই হবে।

দুনিয়ায় সুখ ও দুঃখকে পৃথক করার উপায় নেই। আর আখিরাতে সুখ ও দুঃখকে একত্র করার কোনো সুযোগ নেই। যারা বেহেশতের সুখ পেতে আগ্রহী তাদেরকে দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা মেনে চলতে গিয়ে যত অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা সবই সইতে হবে। দোযখের দুঃখ থেকে যারা বাঁচতে চায় তাদেরকে আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে চলার যাবতীয় সুখ ত্যাগ করতেই হবে।

সুখ চায় না– এমন কোনো মানুষ নেই। প্রত্যেকেই যা কিছু করে সুখের আশায়ই করে। নিজের দুঃখ বাড়ানোর নিয়তে কেউ কোনো কাজ করে না। এমনকি যে আত্মহত্যা করে সেও সুখের নিয়তেই করে। সে মনে করে যে, বেঁচে থাকার দুঃখ থেকে বাঁচার জন্য মরণেই সুখ; কিন্তু তার এ হিসাব কি সঠিক? তাই প্রত্যেকেই সুখের নিয়তে সব কাজ করলেও হিসাবের ভুলে দুঃখ ভোগ করে। যা করলে দুঃখ আসবে তা সুখের নিয়তে করার মতো বোকামি করার কারণেই মানুষ সুখের আশায় এমন কিছু করে, যার ফল দুঃখ।

www.priyoboi.com

Philosophic Definition of Heaven and Hell

Heaven is that eternal abode where there is no want except want, want of all wants and want of nothing else.

Hell is that eternal abode where there is only want and nothing else.

বেহেশতে যা নেই দোযখে তা-ই আছে। আর দোযখে যা আছে তা বেহেশতে নেই।

সমাপ্ত

www.priyoboi.com